ওলী হওয়ার আসান তরীকা

রাহে নাজাত - ৩

ডক্টর আ.ফ.ম.আবু বকর সিদ্দীক

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুন্শী মোহাম্মদ বরকত উলাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স, ১৯৬৭ সালে এম এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmed Sirhindi (Rh.) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি.এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩০-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এ.এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উলেখ করা হচ্ছে : ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র); ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব; ৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র); ৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)-জীবন ও কর্ম; ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ; ৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া; ৮. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া; ৯. মাবদা ওয়া মা'আদ; ১০. ইছবাতুন নুবুওয়াত; ১১. আবু দাউদ শরীফ (১ম-৫ম খণ্ড); ১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া; ১৩. স্মরণকালের মরণজয়ী; ১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ ৩০তম পারা (অনুবাদক, ই.ফা.বা.); ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)- ইবনে হিশাম ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২০. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.); ২১. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ; ২২. রূহের সফর; ২৩. নামায পড়ে হবে কি?

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার যোগদান উপলবে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুজাদ্দেদিয়া কমপেক্সক্স নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী করেছেন।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বিগত ৩০-৬-০৮ সনে ৬৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বিভাগের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ১৫-৯-০৮ইং থেকে এ্যাড হক ভিত্তিতে সুপার নিউ মেরারী অধ্যাপক বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন।

www.khasmujaddidia.org

ওলী হওয়ার আসান তরীকা?

রাহে নাজাত-৩

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

ওলী হওয়ার আসান তরীকা?
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায় :
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৮০৫১৯১৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বাংলা
মহররম ১৪৩৪ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : বিশ টাকা মাত্র

WALI HOWAR ASAN TARIKA : by Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur # 12, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-8051918, website : www.khasmujaddidia.org
Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের আরো কয়েকটি বই

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহঃ)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ) ১-৫ম খণ্ড
১১. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৬. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৭. সিরাতুন্নবী (সাঃ)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. রূহের সফর
২০. রূহের খোরাক
২১. আল্-কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২২. Shaikh Ahgad Sirhindi (R.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামাজ পড়ে হবে কী? (রাহে নাজাত-২)
২৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখ্‌লাকে হাসানাহ্।

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ :
* ওলীর বর্ণনা ॥ ০৬
* ওলীর পরিচয় ॥ ০৭
* বেলায়েতের মর্তবা লাভের উপায় ॥ ০৯
* আল্লাহ্‌র প্রিয় কে? ॥ ১০
* আল্লাহ্‌র ওলীগণের বৈশিষ্ট্য ॥ ১১
* কাশ্‌ফ ও কারামত ॥ ১৩

অধ্যায়-২ :
* আসান তরীকার প্রতিষ্ঠাতা : হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম ॥ ১৫

অধ্যায়-৩ :
* শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রা.) কর্তৃক নক্‌শবন্দীয়া তরীকা গ্রহণের পটভূমি ॥ ২০
* মুজাদ্দিদ উপাধি প্রাপ্তি ॥ ২২
* মুজাদ্দিদ (রহ.) কর্তৃক সমস্ত তরীকার নিস্‌বত লাভের ঘটনা ॥ ২৩
* হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর মুজাদ্দেদীয়াত ॥ ২৬
* মুজাদ্দেদীয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য ॥ ২৯

بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحِيمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজমাঈন। আম্মাবাদ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের জন্য ক্ষেতস্বরূপ"। এখানে মানুষ চিরদিন থাকে না, সময় শেষ হলে সবাই চলে যায় না ফেরার দেশে বা আখিরাতের জীবনে।

দুনিয়ার কোন সম্পদ যথা ঘর-বাড়ী, জায়গা-সম্পত্তি, দোকান-পাট, মিল-ইনডাষ্ট্রি, টাকা-পয়সা, কল-কারখানা কিছুই মানুষের সাথে যায়না, সবই এখানে থাকে। মানুষের সাথে তার কবরে যায় কেবল 'আমল বা কাজ' যা দুইভাগে বিভক্ত। যথা– ভাল ও মন্দ।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে, তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বা ওলী। এদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ভয় ও শংকা নেই। মৃত্যুর সময় তাদের রূহ জান্নাত দেখতে দেখতে দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখন দেহ লাশে পরিণত হয়। তাদের কবর হয় জান্নাতের বাগান, হাশরের ময়দানে তাদের মাথার উপর থাকবে আরশের শামিয়ানা, তারা বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাত তথা জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে যাবে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা– তথা ওলীদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনার মাধ্যমে "ওলী হওয়ার আসান তরীকা" এ ছোট গ্রন্থটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে শত ব্যস্ততার মাঝে থেকেও সব সময় আল্লাহ্‌র স্মরণ নিজের হৃদয়ে ধারণ করা যায় এবং একই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা কল্যাণকর ও মংগলময়, সে সম্পদ সংগ্রহ করা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা সব মুমিন মুসলমানকে তাঁর 'ওলী' হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

* ওলীর বর্ণনা :

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ওলীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

اَلآ اِن اَولِيَاءَ اللهِ لاَخوفٌ علَيهِم ولاَهم يحزنونَ.

অর্থ : জেনে রাখ! নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র ওলী তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না।"[১]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দা তথা আল্লাহ্‌র ওলী, কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। তারা কোন প্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, আর তাদের কোন দুঃখ ও বেদনা থাকবে না। তারা হবেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য ধন্য।

জানা দরকার, আল্লাহ্‌র ওলী কারা? পরবর্তী আয়াতে এর জবাব রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

اَلَّذِين امنوا وكَانوا يتقُونَ.

অর্থ : "যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সদা সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"[২]

অতএব জানা গেল, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান হলো আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার পূর্বশর্ত। যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র ঈমানের নূরে আলোকিত এবং যাদের অন্তরে সব সময় আল্লাহ্‌র ভয় থাকে যে, তিনি আমার সব কথা-বার্তা শুনছেন এবং কাজ-কর্ম দেখছেন, এ ধরনের ব্যক্তিরা বেলায়েত বা ওলীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

১. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২
২. প্রাগুক্ত আয়াত : ৬৩

اَللّٰه ولى الذِين امنوا.

অর্থাৎ "যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ পাক তাদের ওলী বা তাদের বন্ধু।"[৩]

উল্লেখ্য যে, ঈমানই হলো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়, আর এই নৈকট্যের সর্বশেষ মর্তবা হলো– নবী-রাসূলদের। আর সাইয়েদুল মুরসালীন হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

* আল্লাহ্র ওলীর পরিচয় :

সুফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায়, আল্লাহ্র ওলী তাকে বলা হয়, যার 'কলব' বা অন্তর সব সময় আল্লাহ্র 'যিকির' বা স্মরণে মগ্ন থাকে। সে সকাল-সন্ধ্যা তথা সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকে। আল্লাহ্র মহব্বতে তার অন্তর পরিপূর্ণ থাকে, সেখানে আর কারোও মহব্বত থাকেনা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা পরিবারবর্গের সাথে যে মহব্বত থাকে, তা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

কেননা, হক দু'ধরনের : আল্লাহ্র হক এবং বান্দাদের পারস্পরিক হক। কারো সাথে শত্রুতা থাকলেও তা হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। তিনি যদি কাউকে কিছু দান করেন, তবে তাও হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর যদি দান করা থেকে বিরত থাকেন, তাও হবে আল্লাহ্কে রাজী করার লক্ষ্যে। আল্লাহ্র ওলীগণ শুধু আল্লাহ্র মহব্বতেই একে-অন্যকে ভালবাসেন। সুফীদের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'ফানায়ে কলব' বলা হয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র ওলীগণ তাক্ওয়া ও পরহেজগারীর গুণে গুণান্বিত হন। যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না, তা থেকে দূরে থাকেন। অহংকার, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা থেকে আল্লাহ্র ওলীদের মন পবিত্র থাকে। সুফিয়ায়ে কিরাম এই অবস্থাকে "ফানায়ে নাফস" বা নাফসের ফানা বা বিলীন বলে আখ্যায়িত করেন। যখন কোন ব্যক্তি এই স্বরে পৌঁছে, তখন শয়তান তার নিকট পরাজয় স্বীকার করে।

৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৭।

হযরত উমর খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

"কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা নবীও নন, শহীদ ও নন, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের নৈকট্যের মর্তবা দেখে নবী ও শহীদগণ বিস্মিত হবেন।"

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! তাদের পরিচয় কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ

"যারা আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে মহব্বত রাখে। কোন আত্মীয়তার বন্ধনে নয়, অর্থ-সম্পদের লেন-দেনের কারণে নয়, বরং শুধু আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের কারণে তারা আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে মহব্বত রাখে।"

"আল্লাহ্র কসম! কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময়, নূরের প্রতীক।"[৪]

হাদীসে কুদ্সীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে; ফলে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, ..."[৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স.)!

"আল্লাহ্র ওলী কারা? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন : "তারা সেসব লোক, যাদের তুমি সব সময় আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল দেখবে।"[৬]

বস্তুতঃ যারা খাঁটি মুমিন, যারা আল্লাহ্র ওলী, তাদের মন আল্লাহ্র মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকে, তারা সব সময় আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত থাকে।

৪. আল-হাদীস, আবু দাউদ বর্ণিত।
৫. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।
৬. আল-হাদীস বর্ণিত।

তাদের সব আশা-ভরসা কেবলই আল্লাহ্‌র কাছে। তাই কোন শত্রুর শত্রুতা, বা কোন বিপদাপদ তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে না।

যারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি খাঁটি ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবী মুতাবিক তাক্ওয়া অবলম্বন করে; যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতের কারণে আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভালবাসে, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে তারা আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, এমন ব্যক্তিরাই হলো আল্লাহ্‌র ওলী বা পরম বন্ধু।

* বেলায়েতের মর্তবা লাভের উপায় :

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ইত্তেবা বা অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই বেলায়েতের বা ওলীত্বের মর্তবা লাভ করা যায়। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মাধ্যমেই বেলায়েতের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

পরবর্তী সময় বা এখন বেলায়েত বা ওলীত্ব অর্জনের মাধ্যমে হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওলীদের আনুগত্য ও অনুসরণ খুবই জরুরী।

তাদের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর ও বাহির আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়। একেই বলে "সিবগাতুল্লাহ" বা আল্লাহ্‌র রঙ। এ সম্পর্কে এক আয়াতে উল্লেখ আছে :

صِبغةُ اللهِ ومن أحسن مِن اللهِ صِبغةً.

অর্থাৎ আর আল্লাহ্‌র রঙ এবং আল্লাহ্‌র রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে?[৭]

আল্লাহ্‌র ওলীদের প্রবর্তিত তরীকার মাধ্যমে বিরতিহীনভাবে যিকির করার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। এর ফলে দূরীভূত হয় কলব বা হৃদয়ের ময়লা। তখন আত্মা হয় আয়নার মত স্বচ্ছ ও পবিত্র।

৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : আয়াত : ১৩৮

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন :

لِكُل شيئٍ صِقَالَةٌ وصِقَالَةِ الْقُلُوبِ ذِكْر اللهِ. (البيهقى)

"প্রতিটি বস্তু পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে শানযন্ত্র। আর কলব বা অন্তর পরিষ্কার করার শানযন্ত্র হলো– আল্লাহ্‌র যিকির।"[৮]

মহান সুফীগণের মতে, যারা এই বিশেষ মর্যাদা লাভে সক্ষম হন, তারাই আল্লাহ্‌র ওলী। তারা সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরে মত্ত থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তথা সব সময় তারা আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ পাঠে মশগুল থাকে। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মহব্বত তাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন : "প্রকৃত কল্যাণের পথ হলো– যিকিরকারীদের সাথে থেকে সব সময় যিকির করা, আর একা থাকলেও কলবে যিকির জারী রাখা।[৯]

* আল্লাহ্‌র প্রিয় কে?

আল্লাহ্‌র ওলীদের মধ্যে একটি দল আল্লাহ্ তায়ালার মাহবুব বা প্রিয় হওয়ার তাওফিক লাভ করেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাঈল (আ.)কে ডেকে বলেন ঃ আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালবাসি; অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্‌রাঈল (আ.)ও তাকে ভালবাসতে থাকে এবং আসমানের সব ফিরিশতাদের ডেকে বলেন ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, আমিও তাকে ভালবাসি, তাই তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানের সব ফিরিশতা তাকে ভালবাসে। তখন সে পৃথিবীবাসীদের কাছেও ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়।"

৮. আল-হাদীস, বায়হাকী বর্ণিত।
৯. আল-হাদীস, বায়হাকী বর্ণিত।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন বান্দাকে ঘৃণা বা অপসন্দ করেন, তখন তিনি জিবরাঈল (আ.) কে ডেকে বলেন ঃ আমি আমার অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমি তাকে ঘৃণা কর। তখন জিব্রাঈল (আ.) তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং আসমানের ফিরিশতাদের ডেকে বলেন ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন, আমিও তাকে ঘৃণা করি, তাই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর।

একথা শুনে আসমানের সব ফিরিশতা তাকে ঘৃণা বা অপসন্দ করে। এর ফলে, অবশেষে সে যমীনের অধিবাসীদের কাছেও ঘৃণার পাত্র হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা ও অপসন্দ করে।[১০] (বলে : শয়তানটা মরেছে, ভাল হয়েছে!)

* আল্লাহ্র ওলীগণের বৈশিষ্ট্য ঃ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! ওলী কারা?

জবাবে তিনি (স.) বলেন ঃ "যাদের দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন : আমার বান্দাদের মধ্যে তারাই ওলী, যাদের কথা স্মরণ হলে আমার স্মরণ হয় এবং আমার স্মরণ তাদের যিকিরের মাধ্যমে হয়।"[১১]

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

"আমি কি তোমাদের বলবো, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? জবাবে সাহাবীগণ বলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল (স.)! অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন : যাকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়।"[১২]

উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহ্র আল্লাহ্র ওলী, তারা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য-ধন্য হন। তারা সব সময় আল্লাহ্র সাথে থাকেন। এজন্য তাদের সাক্ষাৎ,

১০. আল-হাদীস, মুসলিম শরীফ বর্ণিত।
১১. আল্-হাদীস ইমাম বাগাবী
১২. আল্-হাদীস, ইবনে মাজাহ বর্ণিত।

আল্লাহ্ পাকের স্মরণের কারণ হয়। এর উদাহরণ হলো :

যদি কোন আয়নাকে সূর্যের আলোর সামনে রাখা হয়, তখন সূর্যের আলোর কারণে আয়নাটি আলোয় ঝলমল করে উঠে এবং ঐ আয়নার সামনে যা রাখা হয়, তাও আলোকিত হয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ওলীদেরকে অন্যকে প্রভাবান্বিত করার বিশেষ শক্তি দান করেন। তাই তাদের সোহ্বত বা সংসর্গ আল্লাহ্ পাকের সোহবততুল্য এবং তাদের স্মরণ আল্লাহ্র স্মরণের অনুরূপ হয়। তাই তাদের দর্শন যারা লাভ করে, তাদের সাথে উঠা-বসা করে , তারা কখনো বঞ্চিত ও পথভ্রষ্ট হয় না। আর যারা তাদের অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো হিদায়েতের ফয়েজ বা নূর লাভ করতে পারে না।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আল্-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

والله لايهدى القوم الفاسقين.

অর্থ : "আর আল্লাহ্ ফাসিক কাওমকে হিদায়েত দান করেন না।"[১৩]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান ও আনুগত্য রাখে না, আল্লাহ্ পাক এমন সম্প্রদায়কে হিদায়েত দেন না।

উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহ্র ওলীদের অবজ্ঞা করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন :

من عادلى وليا فقد اذنته للحرب.

অর্থাৎ "যে আমার ওলীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে, আমার তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।[১৪]

একবার বিখ্যাত সাহাবী হযরত হান্জালা (রা) বলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমরা যখন আপনার দরবারে থাকি এবং আপনি জান্নাত ও

১৩. আল্-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৮০।
১৪. আল্-হাদীস, হাদীসে কুদসী বর্ণিত। এর বাস্তবতা আল্লাহ্র ওলীদের জীবনে অসংখ্য কাশ্ফ ও কারামতের মধ্যে বর্ণিত আছে। ওলীদের জীবনী পড়ুন।

জাহান্নামের কথা বর্ণনা করেন, তখন আমরা বাস্তবে জান্নাত-জাহান্নাম দেখি। কিন্তু যখন আপনার সোহ্বত থেকে দূরে সরে যাই এবং সংসারের কাজে লিপ্ত হই, তখন সব কিছু ভুলে যাই।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্র কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি তোমরা সব সময় আমার নিকট থাকতে, তবে ফিরিশ্তারা উঠতে বসতে সব সময় তোমাদের সাথে মোছাফাহা বা করমর্দন করতো! (সুব্হানাল্লাহ!)

কিন্তু হানজালা, এটা হচ্ছে পৃথিবী। তাই এখানে সে সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন।[১৫]

*** কাশ্ফ ও কারামত :**

উল্লেখ্য যে, সাধারণ মানুষ কাশ্ফ বা আত্মিক দর্শন এবং কারামত বা অলৌকিকত্বকে বেলায়েতের বিশেষ নিদর্শন বলে মনে করে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ অনেক ওলীদের মধ্যে বিষয় দু'টো বিদ্যমান থাকে না।

আবার যারা ঈমানদার নয়, তাদের দ্বারাও কখনো কখনো অলৌকিক অনেক কিছু প্রকাশ পায়। সুতরাং এটি বেলায়েত বা ওলী হওয়ার জন্য মাপকাঠি নয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র ওলীদের মাধ্যমে কাশ্ফ ও কারামত প্রকাশিত হলেও এ দু'টোকে বেলায়েতের প্রধান নিদর্শন বলে মনে করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, কোন অলৌকিক ঘটনা যখন কোন নবীর মাধ্যমে ঘটে, তখন তাকে মুজিযা বলা হয়। আর এটি যখন কোন ওলীর মাধ্যমে ঘটে, তখন তাকে কারামত বলা হয়।

কেননা, মহান আল্লাহ আল্-কুরআনে তাঁর প্রিয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন :

---

১৫. আল্-হাদীস, মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

قُلْ اِنما أنا بشر مِثْلُكُم يوحى الَى.

অর্থ : "হে রাসূল! আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আমার উপর ওহী নাযিল হয়।"[১৬]

অন্য এক রেওয়ায়াতে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ ولَو كُنت أعلَم الْغيب لاَستكْثَرت مِن الْخير وما مسِنى السوءُ...

অর্থ : "হে রাসূল! আপনি বলুন : আমি যদি গায়েবের সকল জ্ঞানের অধিকারী হতাম; তবে নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারতাম অনেক কল্যাণ এবং মন্দ আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।"[১৭]

অন্য একটি ায়াতে উল্লেখ আছে :

قُلْ اِنما الايات عِند اللهِ.

অর্থ : "হে রাসূল! আপনি বলুন : মুজিযাসমূহ আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন।"[১৮]

---

১৬. আল্-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ১১০।
১৭. আল্-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮।
১৮. আল্-কুরআন, সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৫০।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আসান তরীকার প্রতিষ্ঠাতা

* খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম :

ইমামুত তরীকত ও শরীয়ত হযরত খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ বুখারী (রহঃ) ৭১৮ হিজরীর মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বংশের দিক দিয়ে তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। শৈশবকাল হতেই বেলায়েতের নূর তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠে।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলীদের তারবীয়ত ও সোহবত লাভে তিনি ধন্য হন এবং দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর কঠোর রিয়াযত ও সাধনা দ্বারা কামালিয়াত অর্জন করেন। এ সময় তিনি বুখারার সমস্ত খানকাহ্ ও মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতেন, তাছাড়া ওলী-দরবেশগণের খিদ্‌মত ও তাদের পায়খানা পরিষ্কার করার কাজও করতেন।

উল্লেখ্য যে, নফসের পবিত্রতা লাভের জন্য দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি চিন্তা করেন যে, 'পরবর্তী সময়ের মানুষের হায়াত দীর্ঘ হবে না এবং আল্লাহ্ তায়ালার মারিফাত ও মহব্বত হাসিলের জন্য তারা এত কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না। কারণ যতই দিন যাবে, ততই মানুষ দুনিয়ামুখী হবে এবং দুনিযার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে।'

দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনার পর তিনি একটি আসান বা সহজ তরীকা লাভের আশায় আল্লাহ্‌র দরবারে একাদিক্রমে পনের দিন সিজ্‌দায় পড়ে থাকেন। শুধুমাত্র নামাযের সময় হলে জামাতে ফরয নামায আদায় করতেন, বাকী সময় সিজদারত থাকতেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি এক লোক্‌মা খানা বা এক ফোঁটা পানি স্পর্শ করেননি।

খজা বাহাউদ্দিন (রহ.) সিজদায় পড়ে এরূপ দু'আ করতেন : "ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাকে এমন তরীকা দান করুন, যে তরীকায় আসানীর সাথে বা সহজে তোমার মা'রিফাত বা পরিচয় লাভ করা যায় এবং তালেবা মাওলা যেন মাহরূম না হয়।"

কখনও কখনও তিনি এরূপ মনে করতেন যে, যদি তার দু'আ কবুল না হয়, তাহলে তিনি সিজদার মধ্যেই নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করবেন। সেজন্য তিনি বলতেন ঃ

"ইয়া আল্লাহ! আপনার দরবারে সিজদার মধ্যে যদি আমার ইনতিকাল হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার খুন মাফ করে দিলাম। আমি উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্য আসার তরীকার দাবী আদায় না করে সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাব না!"

সিজ্‌দার মধ্যে মাঝে মাঝে 'ইল্‌হাম' হতো ঃ "আমি যেরূপ চাই, তুমি সেরূপ তরীকা গ্রহণ কর।" আর তিনি বলতেন ঃ

"ইয়া আল্লাহ! আপনার বান্দা বাহাউদ্দিন যেমন আসান তরীকা চায়, তাকে তাই দান করুন।"

অবশেষে পনের দিনের পর আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে এরূপ ইল্‌হাম বা নির্দেশ হলো ঃ "আমি তোমাকে এমন তরীকা দান করব, যে তরীকায় দাখিল হওয়ার পর কেউ মাহরূম বা বঞ্চিত হবে না।"

আরো ইল্‌হাম হলো ঃ "মানুষের শরীরে দশটি লতীফা আছে এর মধ্যে পাঁচ লতিফা 'আলমে আমরের' বা সূক্ষ্ম জগতের এবং পাঁচ লতিফা 'আলমে খালকের' বা জড় জগতের।

'আলমে আমরের পাঁচ লতিফা : কলব, রূহ, সির, খফী ও আখ্‌ফা নূরের তৈরী, সেজন্য তা নূরানী। আল্লাহ্ তায়ালা 'আমর' শব্দের ব্যাখ্যায় আল্-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

اِنما اَمره اِذَا اَراد شيئًا اَنْ يقُولَ له كُن فَيكُونُ.

অর্থ ঃ "বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি বলেন ঃ হও; আর অমনি তা হয়ে যায়।"[১৯]

অর্থাৎ 'কুন্' শব্দ দ্বারা যাকিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 'আলমে আমরের পাঁচ লতিফা শামিল বা অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, 'আলমে খালকের বা জড় জগতের পাঁচ লতিফা যুল্মত অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর তা হলো : আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও নাফস।

উল্লেখ যে, নক্শাবন্দীয় তরীকা প্রচার ও প্রসারের পূর্বে বুজুর্গানে দ্বীন প্রথমে 'নাফসের তাযকিয়া' বা প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু নাফস যুলমত বা কালো কয়লার মতো হওয়র কারণেই তা ইস্লাহ বা সংশোধন হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো। নাফসের ইসলাহের জন্য আগের বুজুর্গরা 'তালেবে মাওলাকে'[২০] যে পথ অনুসরণের উপদেশ দিতেন, তা ছিল 'তরকে হাকীকী' অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করা।

নাফসের পবিত্রতা হাসিলের জন্য 'তালেবে মাওলাকে' যে কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম করতে হতো, তা হযরত অহেদ উদ্দীন কিরমানী (র.)-এর কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : "আওহাদী শশ্ত সাল সখ্তী-দীদ্! তা-শবে রুয়ে নেক-বখ্তী দীদ!!

অর্থাৎ "অহেদ উদ্দীন ষাট বছর কঠোর সাধনার পরই এক রাতে সৌভাগ্যের মুখ দর্শন করেন।" (সুব্হানাল্লাহ্!)

আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হতে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র)-এর উপর এরূপ ইল্হাম হয় যে, 'নাফসের ইসলাহ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর কালব যেহেতু নূর হতে 'সৃষ্ট' স্বচ্ছ আয়নার মতো, তাই তুমি প্রথমে কলবের ইসলাহ্ কর, তাহলে মানুষে অন্তর অতি তাড়াতাড়ি

১৯. আল্-কুরআন, সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৮৪।
২০. আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের পথিককে 'তালেবে মাওলা' বলা হয়।

বাতিনী নূরের আলোতে নূরান্বিত হয়ে উঠবে।

বস্তুতঃ 'তালেবে মাওলার' অন্তরে যখন আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বতের নূর পয়দা হয়, তখন আস্তে আস্তে গায়রুল্লাহ্র সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এরূপ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহ.) আল্লাহ্র দরবারে শোকর আদায় করে সিজ্দা থেকে মাথা উঠান এবং নির্দেশ মতো আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্য যারা আসতো, তাদের তারবীয়ত দেয়া শুরু করেন। তিনিই হলেন নকশবন্দ তরীকার ইমাম বা 'আসান তরীকার' প্রতিষ্ঠাতা।

বস্তুতঃ এ তরীকায় অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দিয়ে একজন সালেককে আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও মারিফাত শিক্ষা দেয়া হয়, সেজন্য নক্শবন্দীয় তরীকা অন্যান্য তরীকার চাইতে উত্তম। কারণ এই তরীকার বৈশিষ্ট্য হলো :

১. ঈমান ও আকায়েদ আহ্লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাতের উপর হওয়া;

২. কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা;

৩. যতটুকুই আমল করা হোক না কেন, তার মধ্যে ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকা এবং

৪. এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ থেকে গাফিল না হওয়া।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফেছানী শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.)-এর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করুন, যিনি সকল তরীকার ফয়েজ হাসিল করেন, প্রত্যেক তরীকার খিলাফত অর্জন করেন এবং সব মাকামে সায়ের বা পরিভ্রমণ করেন। এর পরেও তিনি নকশবন্দীয়া তরীকা গ্রহণ করে, একে নিজের তরীকা রূপেই

গ্রহণ ও প্রচার করেন।[২১]

উল্লেখ্য যে, খাজা নকশবন্দ (র) বলেন : আমাদের তরীকার মাশায়েখদের উসুল হলো চারটি :

১. হুশ দর দম বা সর্বদা যিকিরের প্রতি খেয়াল করা;

২. নযর বর কদম বা সর্বদা সামনে দৃষ্টি দেয়া, তথা এক মাকামের পর অন্য মাকামের খেয়াল করা;

৩. সফর দর ওয়াতন বা নিজের সত্তার মধ্যে ভ্রমণ করা এবং

৪. খিলওয়াত দর আনজুমান বা জনতার মধ্যে নির্জনতা।

২১. হালাতে মাশায়েলে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া; মূল : মাওলানা মুহাম্মদ হাসান নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

* হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহঃ) কর্তৃক নকশবন্দীয়া তরীকা গ্রহণের পটভূমি :

উল্লেখ্য যে, নকশবন্দীয়া তরীকার প্রসিদ্ধ কামিল ব্যক্তি খাজা আমকাংগী (র) একদা কাশফের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, নকশবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (রহঃ) তাকে বলছেন ঃ

"অচিরেই ভারতবর্ষে নবী করীম (স.)-এর একজন খাস প্রতিনিধি প্রেরিত হবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর আওলিয়া সমাজে তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ। সমস্ত দুনিয়ার ওলী আবদাল সকলে তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় আছেন। সেই মহাপুরুষ আমার এ তরীকা গ্রহণ করবেন। তাই ভারতবর্ষে আমার তরীকা প্রচারের জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে পাঠান।

এ নির্দেশ পাওয়ার পর খাজা আমকাংগী (রহঃ) তৎকালীন নকশবন্দীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.) কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং তিনি দিল্লীতে এসে পৌঁছেন। এ সময় শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) হজ্জের উদ্দেশ্যে সিরহিন্দ থেকে দিল্লী পৌঁছে তার এক বন্ধু মাওলানা হাসান কাশ্মীরীর গৃহে অবস্থান করছিলেন।

সে সময় মাওলানা সাহেব কথা প্রসংগে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.)-এর দিল্লী আগমণ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করলে শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহঃ) নকশবন্দীয়া তরীকা গ্রহণের আশায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। কারণ, তিনি তাঁর পিতা শায়খ আব্দুল আহাদ (রহ.) থেকে এ তরীকার শ্রেষ্ঠত্বের খবর জানতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, খাজা বাকীবিল্লাহ (রহঃ) আগেই নির্দেশ পেয়ে ভারতে আসেন এবং তিনি হযরত রাসূলে পাক (স.)-এর ভাবী খাস প্রতিনিধির আগমণের অপেক্ষায় ছিলেন। মূলতঃ তাঁকে স্বীয় তরীকাভুক্ত করাই ছিল তাঁর ভারত সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর দিকে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) ও

নকশবন্দীয়া তরীকার যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গের সন্ধান করছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় এভাবে উভয়ের আশা পূরণের সুযোগ উপস্থিত হয়।

কথায় বলে : "জহুরী জওহর চেনে।" তাই খাজা সাহেব প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারেন যে, ইনিই সে ব্যক্তি, যিনি বিশাল ভারতে ও সারা জাহানের মহানবী (স.)-এর খাস প্রতিনিধি হবেন বলে আগেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

তাই হযরত শায়েখ আহমদ (রহ:)-এর আগমণে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি এই প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা না করে আবার নিজেই বলেন ঃ আপনি তো হজ্জে সফরে বের হয়েছেন, আমার এখানে কিছুদিন অবস্থান করুন।

ইমামে রাব্বানী শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) খাজা সাহেবের এ অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে নকশবন্দীয়া তরীকায় সাধনা শুরু করেন। তিনি হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.) এর দরবারে মাত্র আড়াই মাস অবস্থান করেন। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরশমণির পরশে নকশবন্দীয়া তরীকার সমস্ত তালিম[২২] পূর্ণভাবে হাসিল করেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) আগেই কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া ও কুবরারিয়া প্রভৃতি পনেরটি তরীকার খিলাফত তাঁর বুজুর্গ পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ (র.)-এর নিকট থেকে হাসিল করেছিলেন।

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র.) হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দীর ন্যায় একজন সুযোগ্য মুরীদের তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে পূর্ণ কামালিয়তের স্তরে পৌঁছে দেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে সিরহিন্দ শরীফে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর সোহবতে এসে অসংখ্য মানুষ ইলমে মারিফাত হাসিল করে আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার সুযোগ পায়।

২২. তা'লিম অর্থ শিক্ষা।

* মুজাদ্দিদ উপাধি লাভ :

হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে সিরহিন্দ শরীফে ফিরে আসলে দলে দলে লোক তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে বায়'আত হতে থাকে।

এ সময় একদিন তিনি ফজরের নামাযের পর তাঁর হুজুরায় মুরাকাবায় মশগুল থাকা অবস্থায় অবলোকন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহানীভাবে সমস্ত আম্বিয়া, অসংখ্য ফিরিশতা এবং আউলিয়া ও গাউস কুতুবদের সংগে সেখানে তাশরীফ এনেছেন। নবী করীম (স.) তাঁর পবিত্র হাতে শায়েখ আহমদ (রহ.) কে একটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক পরিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

"শায়েখ আহমদ! মুজাদ্দিদের প্রতীকস্বরূপ আমি তোমাকে এই 'খিল'আত' বা পোশাক পরিয়ে দিলাম এবং দ্বিতীয় হাযার বছরের জন্য আমি তোমাকে আমার বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করলাম। আমার উম্মতের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব আজ হতে তোমার উপর অর্জিত হলো।"

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাটি ১০১০ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার ফযরের নামাযের সময় সংঘটিত হয়। নবীগণ সাধারণতঃ যে বয়সে নবুওতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হতেন, সেই বয়সে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের সময় হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) "মুজাদ্দিদে আলফে সানি" উপাধিতে ভূষিত হন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর উপর নবীসুলভ দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করেছিলেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "আমার উপর মুজাদ্দেদীয়াত বা সংস্কারকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শুধু পীর-মুরীদী করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়নি। মুরীদগণকে মারিফাতের তালিম বা শিক্ষা দেওয়া আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। যে মহান দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে, তা অনেক ব্যাপক ও বড়। মুরীদদের তরীকতের তালিম দেওয়া এবং মানুষকে কামালিয়াতের দর্জায় পৌঁছানো রাস্তা থেকে কুড়ানো তুচ্ছ

জিনিসের মতই।"[২৩]

* হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) কর্তৃক সমস্ত তরীকার নিসবত লাভের ঘটনা ঃ

হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) যেভাবে এই সম্মানের অধিকারী হন, সে ঘটনাটি "জাওয়াহেরে মুজাদ্দেদীয়া" নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে ঃ

"একদা অভ্যাস অনুযায়ী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) যখন মুরীদের সাথে ফযরের নামাযের পর হালকার মধ্যে মুরাকাবায় রত ছিলেন, তখন হযরত শাহ কামাল কায়থিলী (র)-এর দৌহিত্র হযরত শাহ সেকেন্দার (র) সেখানে উপস্থিত হন এবং একটি খেরকাহ বা জামা হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) এর কাধের উপর রাখেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) মুরাকাবা থেকে ফারেগ হয়ে হযরত শাহ সেকেন্দার (রা) কে দেখে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন এবং সম্মানের সাথে তাকে বসতে অনুরোধ করেন।

তখন হযরত শাহ সেকেন্দার বলেন ঃ আমি আপনার কাঁধে যে খেরকাটি রেখেছি, তা হযরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর স্মৃতির পবিত্র নিদর্শন। এটা আমাদের খান্দানের কাছে দীর্ঘদিন থেকে আছে। আমার বুজর্গ পিতামহ শাহ কামাল কায়থিলী (রহঃ) ইনতিকালের সময় এ জুব্বাটি আমাকে দিয়ে বলেন ঃ

"এটা আমানতস্বরূপ তোমার কাছে রাখ, আমি যখন একে দান করতে বলি, তখন দিয়ে দিও।"

কিছুদিন থেকে তিনি এ জুব্বাটি আপনাকে দেওয়ার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কিন্তু এ অমূল্য সম্পদ হস্তান্তর করতে আমার মন চায়নি। এরপর যখন আমার বুজর্গ পিতাসহ বার বার আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন; এমনকি

২৩. শায়খ আহমদ, মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, ২য় খ, মাকতুব নং-৬।

তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে, তিনি আমার কামালাত ও নিসবত ছিনিয়ে নেওয়ার ধমক দেন, তখন বাধ্য হয়ে এ দুর্লভ আমানত আপনার খিদমতে পেশ করছি।"

উল্লেখ্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) সেই পবিত্র খেরকাহ পরে যখন তাঁর হুজরায় গমণ করেন, তখন তাঁর মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় ঃ

"যদি এই মাশায়েখে কিরাম আমাকে প্রথম থেকেই খলীফা বানাতেন এবং খেরকাহ প্রদান করতেন, তা হলে ভাল হতো। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, হযরত শাহ আব্দুল কাদির জিলানী (র) আমীরুল মুমেনিন সাইয়েদেনা হযরত আলী (রা)-এর সাথে সমুদয় খলীফা, এমনকি শাহ কামাল কায়থিলী (র) সেখানে উপস্থিত। পবিত্র রূহগণের সে এক বিরাট জলসা! তখন বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে স্বীয় নিসবত ও বাতিনী কামালাত দ্বারা ভরপুর করে দেন।

পরে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আমার তারবিয়ত বা প্রতিপালন তো নকশবন্দীয়া তরীকার মাশায়েখগণ করেছেন। কাজেই, আমি তো এই বুজর্গদের দলভুক্ত। এরূপ ধারণার পরেই তিনি অবলোকন করেন যে, সেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর রূহের সাথে হযরত আব্দুল খালেক গাজদেওয়ানী (র) থেকে শুরু করে, হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (রহ.) পর্যন্ত নকশবন্দীয়া তরীকার সব মাশায়েখ তাশরীফ এনেছেন এবং হরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহ.) হযরত শাহ আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর নিকট উপবেশন করেছেন। তখন তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা শুরু হয়ে যায়। নকশবন্দয়িা তরীকার মাশায়েখগণ বলেন ঃ

"শায়েখ আহমদ (র) আমাদের তারবিয়তের দ্বারা কামালিয়াত হাসিল করেছে, আপনি অনর্থক তাকে আপনার দলভুক্ত করার চেষ্টা করছেন!"

এর জবাবে বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) বলেন ঃ "শায়খ আহমদ প্রথমে আমাদের তরীকা থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই,

তিনি আমার রূহানী সন্তান।"

এই আলোচনা চলার সময় সেখানে চিশ্‌তীয়া, কুররাবীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার মাশায়েখগণও তাশরীফ আনেন এবং তাঁরা শায়খ আহমদ (র)কে তাঁদের তরীকাভুক্ত বলে দাবী করেন। কেননা, হযরত মুজাদ্দিদ (র.) প্রথম দিকে তাঁর পিতার মাধ্যমে এসব তরীকার ফয়েয ও নিসবত হাসিল করেছিলেন।

মাওলানা হাশিম কাশ্‌মী (র) এবং মোল্লা বদরুদ্দীন (র) তাদের ইতিহাসে এরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন :

"এ সময় সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর ওলীগণ সিরহিন্দ শরীফে সমবেত হন। এ পবিত্র সময়টি ছিল হিজরীর **১০১১** সনের **১১**ই শাবানের সকাল থেকে জোহরের নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত। অবশেষে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলে, বিষয়টি ফয়সালার জন্য তাঁর খিদমতে পেশ করা হয়।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"যেহেতু শায়খ আহমদের তাকমিল বা পরিপূর্ণতা লাভ 'তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়াতে' হয়েছে, সেহেতু এই তরীকারই রেওয়াজ বা প্রচলন দান করা হোক এবং বাকী অন্যান্য তরীকার সব নিস্‌বত তাঁকে প্রদান করা হোক। যার ফলে, শায়খ আহমদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'মুজাদ্দেদীয়া তরীকাহ' সমস্ত তরীকার সারাংশ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তোমরাও সকলে সমভাবে ছওয়াবের অধিকারী হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ যেহেতু নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানব হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে নক্‌শবন্দীয়া তরীকার উৎপত্তি এবং এই তরীকার মধ্যে অন্য তরীকার চেয়ে দৃঢ়তার সাথে সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, সেজন্য এ তরীকাই তাজ্‌দীদ বা দ্বীনের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য অধিক সহায়ক।

এভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত তরীকার মাশায়েখগণ নিজ নিজ তরীকার পরিপূর্ণ কামালাত হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-কে প্রদান করেন। এর সাথে যুক্ত হয় দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদের খাস কামালাত ও নিস্‌বত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত খাস কামালাতসমূহ। এ ছাড়াও এর সাথে মিলিত হয়- কাইউমিয়াত, ইমামত, খাজিনাতুর রহমত বা রহমতের ভান্ডার প্রভৃতি বিশেষ কামালাত। এর ফলে জন্ম নেয় এক সমষ্টিভুক্ত তরীকা, যা পূর্ববর্তী সমস্ত ওলীদের প্রতিষ্ঠিত তরীকার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সর্বপ্রকার কামালাতের আঁধার নতুন এই সিলসিলার নাম হলো : "তরীকায়ে মুজাদ্দেদীয়া" এ তরীকা অনুসরণ করলে পূর্ববর্তী সমস্ত ওলীদের সিলসিলার ফয়েজ ও বরকত হাসিল হয়ে থাকে।[২৪]

* হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর মুজাদ্দেদীয়াত :

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, তথা 'মুজাদ্দিদ' প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ পাঠানোর সুসংবাদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِن الله يبعثُ لِهذِهِ الأمةِ على رأسِ كُل مِائَةَ سنةٍ من يجدد لَها أَمر دِينها.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এই উম্মতের দ্বীনের সংস্কারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন।"[২৫]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী

---

২৪. দ্রষ্টব্য : হালাতে মাশায়েখ নক্‌শবন্দীয়া ও জাওয়াহেরে মুজ্জাদ্দেদীয়া, পৃষ্ঠা-৩৮, (প্রকাশ থাকে যে, উপরে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা রূহানীভাবে সংঘটিত হয়।)

২৫. আল-হাদীস; আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত।

(র) বলেছেন ঃ প্রত্যেক শতাব্দীর জন্য একজন মুজাদ্দিদই যথেষ্ট। অবশ্য কারো কারো মতে, একের অধিক মুজাদ্দিদও হতে পারে। শাহ ওলীউল্লাহ্ (র) এর মতের অনুসারী।

মুজাদ্দিদ সম্পর্কে এ আলোচনার পর, হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) সম্বন্ধে একথা উল্লেখ্য যে, তাঁর আগে সাধারণতঃ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হতেন। কিন্তু হাজার বছরের মুজাদ্দিদ কেউ হননি; কেননা, দ্বিতীয় হাজার বছর শুরু হয়নি। প্রথম হাজার বছরের মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাস্তিই বিদ্যমান ছিল।

বস্তুতঃ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-এর আগে যত মুজাদ্দিদ ছিলেন, তাঁরা কেউই দ্বীনের সমুদয় শাখা-প্রশাখার জন্য মুজাদ্দিদ ছিলেন না; বরং তাঁরা দ্বীনের বিশেষ বিশেষ শাখার মুজাদ্দিদ ছিলেন। এ কারণে একই সময় কয়েকজন মুজাদ্দিদ হতেন ঃ যেমন, কেউ ইলমে হাদীসের, কেউ ইলমে ফিকাহের এবং কেউ ইলমে মারিফাতের মুজাদ্দিদ।

কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-কে দ্বীনের সমুদয় শাখার উপর মুজাদ্দেদীয়াত দান করে তাঁকে এক বিশেষ মাকামে উন্নীত করেন।

এর অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সকল মুজাদ্দিদ জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (রহ:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব হাসিল করেন।

এই দুই প্রকার প্রতিনিধিত্বের মধ্যে অবশ্যই আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কেননা, তাঁর পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগণের খিদ্মতের প্রভাব ছিল মাত্র এক শতাব্দীর জন্য, কিন্তু তাঁর মুজাদ্দেদীয়তের প্রভাব হলো এক হাজার বছরের জন্য।

উল্লেখ্য যে, কোন মুজাদ্দিদের জন্য তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার ইলম বা জ্ঞান থাকা জরুরী নয়। কিন্তু হযরত শায়েখ আহমদ (রহ:) পূর্ণভাবে নিজ মুজাদ্দেদীয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর

মাকতুবাত শরীফের ২য় খণ্ডের ৪ নং মাকতুব বা চিঠিতে লিখেছেন ঃ

এই ফকীর আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন সম্পর্কে কি বর্ণনা করবে। আর যদি কিছু বর্ণনা করে, তবে তা কে বুঝবে? এই মারিফাতগুলো বেলায়েতের সীমার বাইরে। সাধারণ ওলীরা জাহিরী আলিমদের মত তা বুঝতে অক্ষম। কেননা, এই ইলম নবুওতের প্রদীপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় হাজারের তাজদীদের জন্য প্রকাশ লাভ করেছে। এই ইলম ও মারিফাতগুলোর অধিকারী হলো এই হাজারের মুজাদ্দিদ। যা থেকে জানা যায় যে, তাঁর এই ইলম ও মারিফাত- জাত, সিফাত, আফ্য়াল, হাল, ওয়াজদ, তাজাল্লীয়াত ও জগুরাত ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্ক রাখে ..... ।"[২৬]

তিনি আরো লিখেছেন : "জেনে রাখ যে, প্রত্যেক একশ' বছর পর একজন মুজাদ্দিদ চলে গেছেন। কিন্তু শত ও হাজার বছরের মুজাদ্দিদ এক নয়। শত ও হাজারের মধ্যে যে পরিমাণ প্রভেদ, ঐ পরিমাণ, বরং তার চেয়েও অধিক প্রভেদ উভয় মুজাদ্দিদের মধ্যে বিদ্যমান। দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ ঐ ব্যক্তি, যার মাধ্যমে ঐ সময়- কুতুব, আওতাদ, আবদাল, নুকাবা ও নুজাবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও- উম্মততের নিকট ফয়েজ পৌঁছে।

মুজাদ্দিদের সব চেয়ে বড় পরিচয় হলো তাঁর কাজকর্ম, যা দ্বারা দ্বীনের হিফাযত, সুন্নত প্রতিষ্ঠা ও বিদআত দূর হয়। মুজাদ্দিদের মূল কাজ হলো- বিদআত রহিত করা, উম্মতের ইসলাহ বা সংশোধন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং এই বিশেষ কর্তব্য পালনে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতার পরোয়া না করা।

তাঁর কাজ-কর্ম সর্ব সাধারনের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে। তিনি ওতাঁর অনুসারীগণ বিদআতি, বাতিলপন্থী ও দুনিয়াদার আলিমদের জন্য-

---

২৬. মাক্তুবাত শরীফ, ২য় খণ্ড, মাকতুব নং-৪।

'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহের'- প্রভাব রাখেন। তিনি ও তাঁর মুরীদগণ বাতিলপন্থীদের জন্য আকাশের বজ্রপাত ও ইয়ামনী তরবারীর ন্যায়। কেননা, তিনি এই বাতিলপন্থীদের সমূলে বিনাশ ও জাহেলী যুগের কুসংস্কার ও আকীদার উচ্ছেদ সাধনকারী হন।"[২৭]

উল্লেখ্য যে, হিন্দস্থানে বাদশাহ আকবর[২৮] ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দ্বীন-ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ধর্মের মধ্যে অনেক বিদআত অনুপ্রবেশ করে। এ যুগসন্ধিক্ষণে হিন্দস্তানে দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদরূপে হযরত শায়খ আহমদ (র.)-এর আগমন আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে দ্বীন ইসলামের পূর্ণ হিফাযত করে তার বিপ্লবী সংস্কারের মাধ্যমে দ্বীনের তাজদীদের দায়িত্ব পালন করেন।

* খাস মুজাদ্দেদীয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য :

উল্লেখ্য যে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)- এর পাঁচ হাজার খলীফা ছিলেন। তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে চলে আসা সিলসিলা বা তরিকার নাম- "নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া।"

হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ:)-তার তৃতীয় পুত্র। শুধমাত্র তাঁর মাধ্যমে চলে আসা সিলসিলার নাম- "তরীকায়ে খাস মুজাদ্দেদীয়া"। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-এর খাস কামালাত ও নিস্বত এই সিলসিলার মাধ্যমেই জারী আছে এবং কিয়মত পর্যান্ত থাকবে- ইনশাআল্লাহ।

এ খাস মুজাদ্দেদীয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা পূর্ববতী সমস্ত তরীকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ বিগত যুগের উম্মতে মুহাম্মাদীর ওলীদের আলাদা আলাদাভাবে যে সমস্ত কামালাত প্রদান করা হয়েছিল, তার ফয়েজ ও

২৭. মাক্তুবাত শরীফ, ২য় খন্ড, মাকতুব নং-৪।
২৮. বাদশাহ আকবর 'দ্বীনে-ইলাহী' নামে একটি ধর্ম প্রচার করে। যার মূলমন্ত্র ছিল : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ", আমরা বলবো ঃ নাউজু বিল্লাহ মিন যালিকা।

বরকত সম্মিলিতভাবে এ তরিকার মধ্যে জারি আছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী যুগের সমস্ত ওলীদের যে কামালাত দান করা হয়েছিল, তা সম্মিলিতভাবে তাঁকে প্রদান করা হয়। আর তার পরে একমাত্র ইমাম মেহেদী (আ:) উক্ত কামালাত ও মারিফাত সমূহের পূর্ণ অংশ পাবেন।[২৯]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-আরো বলেছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! এ ফকীর কর্তৃক যে সকল মারিফাত বা গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হচ্ছে, যদি সবাই সম্মিলিতভাবে তা বুঝতে চেষ্টা করে, তবে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে অবশ্যই হযরত ইমাম মেহেদী (আ:)-এই মারিফাত সমূহের পূর্ণ অংশপ্রাপ্ত হবেন।'[৩০]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-তার 'মাব্দাওয়া মাআদ' গ্রন্থে লিখেছেন : একদিন এই ফকীর তার দোস্তদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল, এবং এই ফকীরের দৃষ্টি তখন নিজের খারাবিগুলির প্রতি নিবন্ধ ছিল। এ সময় আমার মনে হয়, ফকীরি ও দরবেশীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এমন সময় 'যে আলাহ্র ওয়াস্তে অবনত নয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন', এই হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে অপমানের অবস্থা থেকে উন্নীত করেন। এ সময় ফকীরের কলব বা অন্তরের গভীরতম কন্দরে এরূপ গায়েবী আওয়াজ অনুভূত হয় ঃ

غَفَرت لَكَ ومن توصلَ لَكَ بِواسِطةٍ اَو بِغير واسِطةٍ الى يوم القِيامةِ.

অর্থ : "আমি তোমাকে মাফ করলাম এবং যে ব্যক্তি মধ্যস্থতায় অথবা বিনা মধ্যস্থতায় কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ওসিলা গ্রহণ করবে, তাকেও মাফ করে দিলাম।"

এই বিষয়টি বার বার আমার কলব বা অন্তরে ধ্বনিত হতে থাকে। অবশেষে সকল সংশয়ের অবসান ঘটে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার

২৯. মাকতুবাত শরীফ, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:), ১ম খন্ড, মাকতূব নং-১৫৬।
৩০. প্রাগুক্ত।

জন্য। তারপর এই নিয়ামতটি প্রকাশ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়।[৩১] সুবহানাল্লাহ্।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:)-এর তরীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ তরীকা। আখেরী যামানায় যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন ইমাম মেহেদী (আ.) জন্ম নেবেন এবং তিনি তাঁরই তরীকার খলীফাগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি ছিলেন কুতুবে মাদার এবং কুতুবে ইরশাদ। কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর তরীকা গ্রহণ করবে, তাদের পরিচয় তাকে জানানো হয়েছিল।

তিনি আরো বলেন : "অন্য তরীকার যেখানে শেষ, এই তরীকার শুরু সেখান থেকে।"

অর্থাৎ অন্যান্য তরীকার কামালিয়াত যেখানে শেষ হয়, এই তরীকার প্রারম্ভে সেই কামালিয়াতের সুফল পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায় : "ইন্দিরাজুন নিহায়াহ ফিল্ বিদায়াহ।" অর্থাৎ শেষের বস্তুকে প্রথমে প্রবেশ করানো হয়েছে"- এরূপ উক্ত আছে।[৩২]

হযরত মুজাদ্দিকে আলফেসানী (রহ:) বলেন : "এই তরীকা আল্লাহ্ প্রাপ্তির যাবতীয় পথ অপেক্ষা অধিক নিকটতর। অন্যান্য তরীকার শেষ এর প্রারম্ভে নিহীত আছে। এর আত্মিক সম্পর্ক অন্যান্য তরীকার আত্মিক সম্বন্ধ অপেক্ষা উচ্চতম। দৃঢ়তার সাথে সুন্নতের অনুসরণ এবং অপছন্দনীয় বিদআত সমূহ থেকে বিরতিই এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।"[৩৩]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:) এর তরীকা, 'তরীকায়ে খাস মুজাদ্দেদীয়া' কারামত ও কামালাকে ভরপুর। তিনি একবার 'তাওয়াজ্জোহ্' বা আত্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপের পর বলেন ঃ

"আমি যদি এই 'তাওয়াজ্জোহ' শুষ্ক কাঠের প্রতি নিক্ষেপ করি, তবে সাথে

৩১. মাব্দা ওয়া আ'আদ, মিন্হা-৫; পৃষ্ঠা-২০।
৩২. মাকতূবাত শরীফ, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)। ১ম খ, মাকতূব নং-২৯০।
৩৩. মাক্তূবাত শরীফ, ১ম খ, মাক্তূব নং-১৩১।

সাথে তা সবুজ বর্ণ ধারণ করবে। আর যদি তা দুনিয়াবাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করি, তাহলে তারা সকলেই নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু কি করবো! উপায় নেই। আখেরী যামানা- ফিত্না ফাসাদময় এবং খায়ের-বরকতশূণ্য। এরূপ নূর ও রহস্যসমূহ প্রকাশ করার অনুমতি নেই। তাই আমি তা প্রকাশ করতে অক্ষম।"[৩৪]

তিনি আরো বলেন : এই তরীকার 'তাওয়াজ্জোহ'-এর দ্বারা মানুষের মৃত কল্ব বা আত্মা জীবিত হয়। এটি এ তরীকার বিশেষ কারামত। কামিলে-মুকাম্মিল মুর্শিদের হাতে বয়'আত গ্রহণ করলে অনেকের সাথে সাথে কল্ব যিন্দা হয়। আর যদি কলবে গুনাহের ময়লা বেশী থাকে, তবে চল্লিশ দিন লাগাতার যিকির-মুরাকাবা করলে কল্ব যিন্দা হয়।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ:) আরো বলেছেন ঃ "যাদের এ তরীকার হিস্সা আছে, তারা মাহরুম বা বঞ্চিত হবে না। আর যাদের এ তরীকায় কোন অংশ নেই, তারা কোন ফায়দা পাবে না।"[৩৫]

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর ওলী বা প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

৩৪. মাক্তূবাত শরীফ।
৩৫. মাক্তূবাত শরীফ।